মাসুদ রানা

একাত্তরের বৈশাখ : দ্বিতীয় পর্ব

[আগের সংখ্যার পর]

৫

বৈশাখ মাসের ৫ তারিখ একাত্তরের ১৯ এপ্রিল সোমবার। টিক্কা খাঁ তার বেতার ভাষণে বাংলাদেশের গণহত্যার কথা স্বীকার করেন। এ সম্পর্কে ১৯ এপ্রিল ১৯৭১ তারিখের যুগান্তর পত্রিকার প্রতিবেদনে বলা হয়—

"বাঙালাদেশে হানাদার পাক সরকারের সামরিক প্রশাসক তথ্য গভর্ণর গতরাত্রে এক বেতার ভাষণে বাঙালাদেশে হানাদার পাক বাহিনী কর্তৃক নিরীহ, নিরস্ত্র, অসামরিক নাগরিকদের পাইকারী হারে হত্যা করার কথা কার্যতঃ স্বীকার করেছেন। গভর্ণরের নাম লেঃ জেঃ টিক্কা খাঁ বলে ঘোষণা করা হয়।

তবে তিনি এই সঙ্গে অজুহাত দেখান যে, সামরিক বাহিনীর ওপর এ দেশে আইনশৃঙ্খলা ফিরিয়ে আনার যে দায়িত্ব অর্পণ করা হয়েছে তা পালন করতে তারা দৃঢ়সঙ্কল্প। তারা পাকিস্তানকে ছিন্নভিন্ন হওয়া থেকে রক্ষা করতে চান।

গতকাল পাক হানাদার নিয়ন্ত্রিত ঢাকা বেতার কেন্দ্র থেকে ভাষণ প্রসঙ্গে টিক্কা খাঁ বলেন, রাষ্ট্রদ্রোহী এবং সমাজবিরোধীদের রিরুদ্ধে সামরিক কার্যকলাপ সুরু করার ফলে যে সব নিরীহ লোক তাদের আশ্রয় দিয়েছিল সেনা বাহিনীর হাতে তারা (নিরীহ ব্যক্তিরা) নিপীড়িত হয়েছে। আসলে, নিরপরাধ ব্যক্তিদের ওপর অত্যাচার করা সশস্ত্র পাক সেনা বাহিনীর ইচ্ছা নয়।

টিক্কা খাঁ এই সঙ্গ হুমকী দেতেও কসূর করেননি যে, রাষ্ট্রদ্রোহীদের সাহায্য করলে সাহায্যকারীদের শাস্তি দেওয়া হবে।

টিক্কা খাঁ স্বয়ং আওয়ামী লীগের সমস্ত নেতা, সদস্য এবং কর্মীদের হত্যা করার নির্দেশ পকা বাহিনীকে দিয়েছিলেন। তিনিই এখন আবার সুর পাল্টে

বলছেন বাতিল আওয়ামী লীগের সব সদস্যই পাকিস্তানের শত্রু নয়।

গভর্ণর টিক্কা খাঁ বলেন, আওয়ামী লীগের সংখ্যা লঘিষ্ঠ একদল চরমপন্থী দলের সংখ্যাগরিষ্ঠদের বর্তমান পরিস্থিতি সৃষ্টি হয়েছে। সুতরাং সাম্প্রতিক ঘটনাবলীর জন্য এরাই দায়ী।

টিক্কা খাঁ স্বীকার করেন যে, সশস্ত্র বাহিনী, ই পি আর এবং পুলিশ বাহিনীর কিছু সদস্য দল ও পদত্যাগ করেছে। তিনি তাদের অবিলম্বে নিকটস্থ সেনা শিবিরে কাজে যোগ দিতে বলেন। অবস্থাগতিকে এদের বিষয়ে সহানুভূতির সঙ্গে বিবেচনা করার আশ্বাসও গভর্ণর (তাঁর বেতার ভাষণে) দেন।

তিনি আরও বলেন, কয়েকজন কর্মচারী ছুটিতে গেছে এবং ছুটি শেষে এখনও কাজে ফেরেনি। এ ছাড়া কয়েকজন বুদ্ধিহীন অফিসারদের দ্বারা ভুল পথে চালিত হয়েছে বলেও টিক্কা খাঁ জানান।

টিক্কা খাঁ বেতার ভাষণে অসামরিক কর্মচারীদেরও অবিলম্বে কাজে ফিরে আসার আবেদন করেন। তিনি বলেন, এখন অবস্থা সম্পূর্ণ স্বাভাবিক। দেশে মজুত খাদ্যও আশানুরূপ এবং আরও খাদ্যসম্ভার আনা হচ্ছে বলে আশ্বাস দেওয়া হয়।

টিক্কা খাঁ এই ভাষণে ভারতীয় অনুপ্রবেশকারীর কথা উল্লেখ করতে ভোলেনি। তিনি বলেন রাষ্ট্রদ্রোহীরা ভারতীয় অনুপ্রবেশকারীদের সঙ্গে মিলে পাকিস্তানকে টুকরো টুকরো করার চেষ্টায় মেতেছে।

খাঁ সাহেব স্বীকার করেন যে, সাম্প্রতিক ঘটনার ফলে পূর্ব বাঙলার অর্থনৈতিক অবস্থার ক্ষতি হয়েছে।"[১]

হত্যা করে নদীতে ফেলে দেয়

দিনাজপুর জেলার হাকিমপুর উপজেলার ছাতনি রাওতারা জি.এম. সিনিয়র ফাজিল মাদ্রাসায় পাকিস্তানিদের ক্যাম্প ছিল। এ হত্যাগুলো ঘটেছে ২ বৈশাখ (১৬ই এপ্রিল) থেকে মে পর্যন্ত। পাকিস্তানি সেনারা বিভিন্ন এলাকা থেকে সন্দেহ লোকজনকে ধরে এনে রাতের অন্ধকারে নির্যাতন করে জবাই ও গুলি করে হত্যা করে পাশের বাড়ির কুঁয়ার মধ্যে ফেলে দেয়। পাকিস্তানিরা ছাতনি মাদ্রাসার আশপাশের বিভিন্ন বাড়ির কুঁয়াগুলো বধ্যভূমি হিসেবে ব্যবহার করেছে। ছাতনির পাশ দিয়ে তুলশি-গঙ্গা নদী বয়ে গেছে।

অগ্রহায়ণ মাসের প্রথম সপ্তাহে এখান দিয়ে সাধারণ একদল সাধারণ মানুষ গ্রাম ছেড়ে পালিয়ে যাওয়ার সময় পাকিস্তানিরা ধরে ব্রাশফায়ারে সবাইকে হত্যা করে নদীতে ফেলে দেয়। এই গণহত্যায় স্থানীয় রাজাকাররা

পাকিস্তানিদের সহযোগীতা করেছে। শহিদের বেশিরভাগ বহিরাগত হওয়ায় তাদের নাম পরিচয় জানা যায়নি। পাকিস্তানিরা ৫ বৈশাখ (১৯ এপ্রিল), মঙ্গলবার ছাতনি গ্রামের কয়েক জনকে গুলি করে হত্যা করে।[২]

নারীদের গণধর্ষণ, পুরুষদের হত্যা

৫ বৈশাখ (১৯ এপ্রিল) দুপুরের সময় তিনদিক থেকে দিনাজপুর জেলার হাকিমপুরের পালপাড়া গ্রামটি ঘেরাও করে লুটতরাজ করা হয়। পালপাড়া গ্রামে তখন লোকজন কম ছিল। তার আগেই পালপাড়ার অনেকেই ভয়ে ভারত পালিয়ে গিয়েছিল। কিন্তু কিছু লোক থেকে যায়। তারা সবাই নূর মোহম্মদের বাড়িতে আত্মগোপন করে। কিন্তু পাকিস্তানি বাহিনী তাদের ধরে বেয়নেট দিয়ে খুঁচিয়ে খুঁচিয়ে আঘাত করে ও পরে গুলি করে হত্যা করে। পালপাড়ায় সেদিন যেসব নারীদের তারা পেয়েছে তাদের গণধর্ষণ করেছে পাকিস্তানি সেনারা। পালপাড়া গণহত্যায় ৭ জন শহিদের নাম পাওয়া যায়। প্রচলিত ধারণা মতে এখানে আরও ৪ জন আহত ব্যক্তি এবং ২ জন নারী ধর্ষিত হন। তবে এখানে আরও সাধারণ মানুষকে হত্যা, আহত ও নারীদের ধর্ষণ করেছে পাকিস্তানি সেনারা।[৩]

সন্দেহ হলেই হত্যা

দিনাজপুর জেলার হাকিমপুর পৌরসভা থেকে ৩ কিলোমিটার পূর্বদিকে যে পাকা সড়কটি ছাতনি চলে গেছে এর পার্শ্ববর্তী এলাকা বড় ডাঙ্গাপাড়া গ্রাম। মুক্তিযুদ্ধ চলাকালীন এখানে পাকিস্তানি সেনাদের একটি ক্যাম্প ছিল। এই ক্যাম্পে বিভিন্ন গ্রাম থেকে সন্দেহ ব্যক্তিদের ধরে নিয়ে এসে নির্যাতনের পর গুলি করে হত্যা করে। বৈশাখ মাসের ৫ তারিখ (১৯ এপ্রিল) বড় ডাঙ্গাপাড়া গণহত্যায় পাকিস্তানি সেনাদের গুলিতে প্রায় শতাধিক লোক শহিদ হয়।[৪]

এদের (পুলিশ সদস্য) আর কোন সন্ধান পাওয়া যায়নি

৫ বৈশাখ (১৯ এপ্রিল) পাকিস্তানি সেনারা রাজশাহী থেকে চাঁপাইনবাবগঞ্জ যাওয়ার পথে গোদাগাড়ী থানার ১৪/১৫ জন পুলিশকে মারপিট করে ও নবাবগঞ্জের দিকে নিয়ে যায়। এদের আর কোন সন্ধান পাওয়া যায়নি। হতভাগ্য পুলিশ সদস্যরা ছিলেন- দিলশাদ বিশ্বাস (এস. আই), দেওয়ান আব্দুস সামাদ (এ এস আই), জাকির হোসেন (কনস্টেবল), মসলেম উদ্দিন (কনস্টেবল), আব্দুর রউফ (কনস্টেবল), আবদুল ওয়াহেদ (কনস্টেবল) প্রমুখ।[৫]

মানুষের রক্তে লাল হয় হাফিজ কমরউদ্দিনের পুকুর

লালমনিরহাট শহরের নিউকলোনী পুকুকুরপাড় অবাঙালি হাফিজ কমরউদ্দিনের দখলে ছিল। বিহারিদের সর্দার হাফিজ তখন খুবই প্রভাবশালী। ২নং ফুলগাছ এলাকার একটি পরিবারের কয়েকজন লোক কমরউদ্দিনের জমিজমা দেখাশোনা করতেন এবং দোকানের কর্মচারী হিসেবে কাজ করতেন। এই কারণে ঐ পরিবারের সাথে কমরউদ্দিনের সুসম্পর্ক গড়ে উঠেছিল। সেই সম্পর্কের সূত্রে তিনি পরিবারটিকে অভয় দিয়ে বলেছিলেন, তারা যেন পালিয়ে না গিয়ে তার কাছে থাকে। তিনি তাদেরকে হেফাজত করবেন।

পরিবারটি যুদ্ধ শুরুর পর ফুলগাছ থেকে গোড়কমন্ডলে পালিয়ে গিয়েছিল। কিন্তু কমরউদ্দিনের আশ্বাসে পরিবারটি শহরে ফিরে আসে। নিউকলোনীর পরিত্যক্ত দুইটি বাড়িতে ঐ পরিবারের ২১ সদস্যের থাকার ব্যবস্থা করা হয়। এর মাত্র এক সপ্তাহের মাথায় ৫ বৈশাখ (১৯ এপ্রিল) এই পরিবারের উপর ধারালো অস্ত্র সহকারে বিহারিরা ঝাঁপিয়ে পড়ে এবং তিন শিশুসহ পরিবারটির ১৮জনকে জবাই, খুঁচিয়ে, পিটিয়ে, বললমের হানা দিয়ে হত্যা করে। মানুষের রক্তে লাল হয় হাফিজ কমরউদ্দিনের পুকুর।[৬]

পাকিস্তানি মেজর তলব করেছেন বলে ধরে নিয়ে গিয়ে হত্যা করে

লালমনিরহাট শহরের একটি পাড়ার নাম মাষ্টারপাড়া। ১৯৭১ সালের ১৮-১৯ এপ্রিল এই পাড়ায় বড় ধরণের গণহত্যা চালায় পাকিস্তানি সেনা ও বিহারিরা। ৫ বৈশাখ (১৯ এপ্রিল) বিহারিরা সিপি (চিলড্রেন পার্ক হাই) হাই স্কুলের প্রধান শিক্ষক মাষ্টারপাড়া নিবাসী মোস্তফা হাসান আহমেদ, পিতা- আব্দুল মোত্তালি'কে রাস্তা থেকে ডেকে নিয়ে হত্যা করে। তিনি রাস্তায় দাঁড়িয়ে রেল কর্মচারী রোকনউদ্দিন মোল্লার সাথে গল্প করছিলেন। এ সময় কয়েকজন বিহারি যুবক 'মেজর ডেকেছেন' এমন কথা বলে তাদেরকে ডেকে নেয় এবং মাষ্টারপাড়া এলাকাতেই গণহত্যা করে। একই দিনে মাষ্টারপাড়ায় বসবাসরত ম্যারেজ রেজিস্ট্রার কাজী লুৎফর রহমান, সানোয়ার হোসেন সানুসহ আরো অনেককে হত্যা করা হয়।[৭]

আত্মরক্ষার জন্য বাঙ্কারের মধ্যে লুকানোর চেষ্টা

৫ বৈশাখ (১৯ এপ্রিল) পাকিস্তানি বাহিনীর নির্বিচার গুলিবর্ষণ, মর্টারশেল নিক্ষেপের হাত থেকে প্রাণে বাঁচতে পুরাতন পঞ্চগড়ের সেকেন্দার আলী

ভূঁইয়া মাস্টার তাঁর ছেলে মেয়ে নিয়ে চলে যান মিঠাপুকুর এলাকায়। সেখানে অন্যদের সাথে তিনিও ছেলে মেয়ে নিয়ে মফিজউদ্দিনের বাড়িতে নিজেদের তৈরি করা একটি বাঙ্কারে আশ্রয় নেন। রাজাকারদের মাধ্যমে পাকিস্তানি সেনারা খবর পেয়ে দুপুর ১২টার দিকে মেশিনগান দিয়ে গুলি করলে প্রায় ২০ জনের মধ্যে কমপক্ষে ১০ জন নিহত হন। প্রাণে বেঁচে যান সেকেন্দার আলী ভূঁইয়া মাস্টারের মেয়ে রওশন আরা'সহ ৫জন।[৮]

মুক্তিযোদ্ধাদের প্রতিরোধের প্রতিশোধ নেয় কয়েকশ গ্রামবাসীকে হত্যা করে

১৯৭১ সালের ৫ বৈশাখ (১৯ এপ্রিল) পাকিস্তানি বাহিনী পাবনার তৎকালীন ডাববাগান আজকের শহীদনগর গ্রামে বর্বরোচিত হামলা চালিয়ে কয়েকশ গ্রামবাসীকে নির্বিচারে হত্যা করে। আজো পাবনাবাসী ১৯ এপ্রিল শহীদনগর গণহত্যা দিবস হিসেবে পালন করে। পাবনার সাঁথিয়া উপজেলার কাশীনাথপুর ইউনিয়নের গ্রাম ডাববাগানকে এখন সবাই চেনে শহীদনগর নামে। পাবনা-ঢাকা মহাসড়কের পাশে ছোট্ট এই গ্রামে মুক্তিযুদ্ধের রয়েছে বীরত্ব ও বেদনাগাথা। ১৯৭১ সালে ২৫ মার্চের পর কুষ্টিয়া জেলার শান্তিডাঙ্গা গ্রামের বাসিন্দা ইপিআর সুবেদার গাজী আলী আকবরের নেতৃত্বে সংগঠিত হওয়া মুক্তিযোদ্ধারা ডাববাগান এলাকায় পাকিস্তানিদের বিরুদ্ধে ব্যাপক প্রতিরোধ গড়ে তোলেন। ঢাকা থেকে উত্তরবঙ্গের দিকে এগিয়ে আসা পাকিস্তানি সেনাদের সঙ্গে প্রথম একটি সম্মুখযুদ্ধে অর্ধশতাধিক পাকিস্তানি সেনা মারা যায়।

এই যুদ্ধে পরাজয়ের প্রতিশোধ নিতে পাকিস্তান বাহিনী ৫ বৈশাখ (১৯ এপ্রিল) রাতে ব্যাপক হামলা চালায়। আধুনিক অস্ত্রে সজ্জিত পাকিস্তানি বাহিনীর সঙ্গে টিকতে না পেরে মুক্তিযোদ্ধারা পিছু হটতে বাধ্য হন। পাকিস্তানি বাহিনী ডাববাগান, কুড়িয়াল, ভদ্রবাটি, বড়গ্রাম, সাটিয়াকোলাসহ কয়েকটি গ্রাম আগুন লাগিয়ে পুড়িয়ে দেয়। হত্যা করে আব্দুল লতিফ শেখ, সাবেক চেয়ারম্যান আফাজ ডাক্তার, খোয়াজ শেখ, কাজেম আলী, জাকের আলী শেখ, পিয়ার মণ্ডল, সৈয়দ আলী মোল্লা, জগনারায়ণ বিশ্বাসসহ কয়েকশ নিরীহ গ্রামবাসীকে।[৯]

নিরীহ মানুষকে হত্যা করে থানার পাশে গণকবর দেয়

৫ বৈশাখ (১৯ এপ্রিল) পাকিস্তানি বাহিনি বগুড়ার ধুনট থানায় আক্রমণ করে ১ জনকে গুলি করে হত্যা করে। ২৭ এপ্রিল পাকিস্তানি বাহিনি পুনরায় উক্ত থানা আক্রমণ করে ৫ জন বাঙালি সিপাহীকে হত্যা করে। ৭ সেপ্টেম্বর

পাকিস্তানি বাহিনি ১৭ জন নিরীহ লোককে হত্যা করে থানার পাশে গণকবর দেয়। পাকিস্তানি বাহিনির হাতে যারা শহিদ হন, তাদের নাম উদ্ধার করা সম্ভব হয়নি।[১০]

পিঠ মোড়া করে বেঁধে ব্রাশফায়ার

২৮ মার্চের পর থেকে পাকিস্তানি বাহিনী ও তাদের সহযোগী বিহারিরা খুলনা শহরে গণহত্যা চালাতে শুরু করলে শহর থেকে পালিয়ে শতশত মানুষ আড়ংঘাটাসহ পার্শ্ববর্তী গ্রামসমূহে আশ্রয় নেয়।

৫ বৈশাখ (১৯ এপ্রিল) খুলনা জেলা রাজাকার বাহিনী ডেপুটি কমাণ্ডার শেখ মনিরুল ইসলাম ওরফে মনু শেখ কয়েকটি গাড়ি ভর্তি পাকিস্তানি সেনা ও রাজাকার নিয়ে আড়ংঘাটা গ্রামে আক্রমণ চালায়। মনু শেখের বাহিনী আড়ংঘাটায় পৌছাবার পূর্বে এর পূর্ববর্তী গ্রাম গাইকুড়ের গাজী বাড়ীর সামনে গাজী আমজাদ হোসেন নামক এক ব্যক্তিকে হত্যা করে। এরপর তারা আড়ংঘাটা গ্রামের কিরণ চন্দ্র সরদারের বাড়িতে আসে। পাকিস্তানি সেনা ও রাজাকাররা কিরণ চন্দ্রের বাড়িসহ আশেপাশের বাড়িসমূহে তল্লাশী চালিয়ে কিরণ চন্দ্র শেন সহ ৭ জনকে ধরে ফেলে।

তাদের সবাইকে একত্রিত করে পিঠ মোড়া করে বেঁধে ব্রাশফায়ার করে। মালুরাম ঢালী নামক এক ব্যক্তি পেটে গুলি লাগে সে তখন বেঁচে গেলেও কয়েকদিন পরে মারা যায়। ৫ বৈশাখ (১৯ এপ্রিল) শহিদ ৬ জনকে কিরণ চন্দ্রের বাড়ির আঙ্গিনায় গণকবর দেওয়া হয়।[১১]

সারিবদ্ধভাবে দাঁড় করিয়ে ব্রাশফায়ার

পাকিস্তানি সেনারা ভোরবেলা খুলনার আড়ংঘাটা কাপালিপাড়া গ্রামে রাজাকার মনু শেখের সহায়তায় আড়ংঘাটা গ্রামে হাজির হয়। সেখানে তারা বিভিন্ন বাড়ি থেকে পালিয়ে থাকা ৬ জন লোককে ধরে কিরণ চন্দ্র সরদারের বাড়িতে আনে। তারপর তাদেরকে সারিবদ্ধভাবে দাঁড় করিয়ে ব্রাশফায়ার করে। এই ব্রাশফায়ারে মালু রাম ঢালী নামে জনৈক ব্যক্তি বাদে সবাই নিহত হন। এরা হলেন ছত্রধর মল্লিক, নির্মল মল্লিক, কিরণ চন্দ্র সরদার, মধূসুধন ঢালী, খোকন ঢালী এবং মোতো ঢালী। এই ছয় জনকে কিরণ চন্দ্র সরদারের বাড়ির উঠানে গণকবর দেওয়া হয়।[১২]

পাকিস্তানি বহিনীর সহায়তায় বিহারিরা হাত-পা বেঁধে হত্যা করে

৫ বৈশাখ (১৯ এপ্রিল) শত্রুবাহিনীর সহায়তায় বিহারিরা চট্টগ্রাম পশ্চিম রামপুরায় কমপক্ষে ৯ জনকে বেঁধে হত্যা করে। নিহতরা হলেন— মনছুরুল হক, মোজাফফর আহমদ, আবদুস সাত্তার, আবু বক্কর, লোকমান খান, আমির খান, আবদুর রাজ্জাক, আবুল কালাম, আবদুন নবী।[১৩]

ট্রেন থেকে থামিয়ে নারীদের ধর্ষণ করে হত্যা

পাকিস্তানি বাহিনী স্থানীয় বিহারিদের যোগসাজশে চাঁপাইনবাবগঞ্জ শহরের আমনুরা বাজারে ৩/4 জন নিরীহ মানুষকে হত্যা করে। এরপর থেকে প্রায় প্রতিদিন ট্রেনযাত্রীদের ট্রেন থেকে থামিয়ে নির্যাতন ও হত্যা করতো। আমনুরাতে রেলওয়ে জংশন ছিল। রাজশাহী-আমনুরা-চাঁপাই নবাবগঞ্জ ও রাজশাহী আমনুরা-রহনপুর রেলপথে ট্রেন চলতো।

পাকিস্তানি বাহিনী নিজেদের চলাচলের স্বার্থে এই রুটে রেলপথ পাহারা দিত। পাকিস্তানী বাহিনীর নির্দেশে বিহারিরাও রাজশাহীর প্রতিটি ট্রেন চেক করতো এবং ইচ্ছেমত কিছু কিছু যাত্রীকে স্থানীয় খ্রিস্টান মিশন ক্যাম্পে ধরে নিয়ে যেত ও নির্যাতন করতো। মহিলা যাত্রীদের আটক করে ধর্ষণ করতো। কোনো কোনো ধর্ষিতাকে হত্যা করতো। ট্রেন যাত্রীগণ অন্য এলাকার হওয়ায় তাদের নাম পরিচয় সংগ্রহ করা সম্ভব হয়নি।[১৪]

ঘোলাঘাট দখল করে বাড়িতে বাড়িতে আক্রমণ

অস্ত্রবোঝাই স্পেশাল ট্রেনযোগে পাকিস্তানি বাহিনী ময়মনসিংহ যাওয়ার পথে ঘোলাঘাট নামক স্থানে মুক্তিযোদ্ধারা সুবেদার সুলতান আহমেদ এর নেতৃত্বে ৬০ জনের একটি দল স্থানীয় জনতার সহায়তায় প্রতিরোধ গড়ে তোলেন। পাকিস্তানি বাহিনী প্রতিরোধ ভাঙ্গার জন্য পাল্টা আক্রমণ চালায়। এক পর্যায়ে মুক্তিযোদ্ধারা পাকিস্তানিদের ভারি অস্ত্রেশস্ত্রের কাছে পিছু হটলে পাকিস্তানি সেনারা ঘোলাঘাট দখল করে এলাকার প্রভাবশালী সিরাজ উদ্দীন কাইয়ার বাড়িসহ অসংখ্য ঘর-বাড়িতে আগুন দেয়। পাকিস্তানি বাহিনী ব্রাশফায়ারে গণহত্যা শুরু করে। এই গণহত্যায় ৮-১০ জন শহিদের মধ্যে নুর মোহাম্মদ মেম্বার নামে একজনের পরিচয় পাওয়া যায়। নুর মোহাম্মদ (৪০) ছিলেন ভিটিপাড়ার কাইয়া পরিবারের জামাতা তৎকালীন স্থানীয় জনপ্রতিনিধি, তার পিতার নাম ওমর আলী মুন্সী। গোলাঘাট ব্রিজের পশ্চিমে ভিটিপাড়ায় তাকে হত্যা করা হয়।[১৫]

কাজ ও রেশন দেয়া কথা বলে চা শ্রমিকদের একত্রিত করে

২৬ মার্চ পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর একটি দল খাদিমনগর চা-বাগানে প্রবেশ করে শ্রমিকদের বস্তিগুলো পুড়িয়ে দেয়। নারী, পুরুষ ও শিশুর উপর নির্বিচারে নির্যাতন চালায়। তাদের অত্যাচারে ২ হাজার শ্রমিক পালিয়ে যায়। চা-বাগানের পশ্চিম ম্যানেজারও পালিয়ে যায়। ফলে চা-বাগানের কার্যক্রম বন্ধ থাকায় কম সংখ্যক শ্রমিক বাগানে অবস্থান করছিলেন। ম্যানেজারের বাসায় পাকিস্তানি সেনারদের এক কর্মকর্তা অবস্থান করতে থাকে।

৫ বৈশাখ (১৯ এপ্রিল) কাজ ও রেশন প্রদানের কথা বলে চা-বাগানে অবস্থানরত সবাইকে এক স্থানে জড়ো হওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়। ৪৬ জন শ্রমিক তাওদর আহ্বানে সাড়া দিয়ে ম্যানেজারের বাংলোর পিছনে সমবেত হলে তাঁদের সবাইকে একটি শ্রমিক কোয়ার্টারে রাখা হয়। সবার নাম তালিকাভুক্ত করার কথা বলে শ্রমিকদের নাম লেখতে শুরু করে। কিছুক্ষণ পরে ঘরের দরজা বন্ধ করে ছোট একটি জানালা দিয়ে টিয়ার গ্যাস দিতে থাকে। পরে জানালা দিয়ে গুলি বর্ষণ করতে থাকে। গ্যাস এবং গুলিতে ৪৪ জন শ্রমিক শহিদ হন। হত্যা শেষে একজন খ্রিষ্টান ছেলেকে দিয়ে ঘরের বাম পাশে একটি গর্ত খনন করিয়ে লাশগুলো মাটি চাপা দিয়ে রাখে।[১৬]

শান্ত পরিবেশকে মৃত্যুপুরীতে পরিণত করে

নাটোর সদর থানার ১নং ওয়ার্ডে চৌকিরপাড়ের অবস্থান। ৩ বৈশাখ (১৬ই এপ্রিল) চৌকিরপাড়ে অবস্থিত নারী পুর্নবাসন কেন্দ্রের পিয়ন হাফিজুর রহমানকে হত্যা করে পাকিস্তানি বাহিনী ও দালাল ঘাতকরা। হাফিজ অফিসের অবস্থা দেখতে এসেছিল। এরপর পাকিস্তানি বাহিনী ৫ বৈশাখ (১৯ এপ্রিল) রাত ১২টার পর আজিজ সরকার, মতি ভূইয়া, চান্দ গাজী নামক দালাল সহ হাফেজ আব্দুর রহমানের নেতৃত্বে পুরো চৌকিরপাড় নিজের অধীনে নিয়ে নেন। তাদের সহযোগীতায় নিকটবর্তী লালবাজার কালীবাড়িতে পাকিস্তানি বাহিনী ক্যাম্প করে। চৌকিরপাড়ের অনেক হিন্দুরা ভারত থেকে নিজ এলাকায় ফিরে এসে মুক্তিযোদ্ধাদের সহযোগিতা করতে থাকেন। এ সংবাদ পেয়ে পাকিস্তানি বাহিনী এই এলাকায় আক্রমণ করে- লুটপাট, ধর্ষণ, অগ্নিসংযোগ করে। পাকিস্তানি সেনা ও সহযোগী দালালরা চৌকিরপাড়ের শান্তি পরিবেশকে মৃত্যুপুরীতে পরিণত করে।[১৭]

৬

একাত্তরের ৬ বৈশাখ। দিনটি ছিল মঙ্গলবার, ২০ এপ্রিল। পাকিস্তানি

সেনাদের তাণ্ডবে অনেক এলাকা লন্ডভন্ড হয়ে গিয়েছিল। বিভিন্ন পত্র-পত্রিকা, গ্রন্থ ও প্রত্যক্ষদর্শীদের ভাষ্য অনুযায়ী পাকিস্তানি সেনারা ৮টি অধিক জেলার ১৫টির অধিক স্থানে গণহত্যা-নির্যাতন চালায়। এছাড়াও পাকিস্তানি সেনারা কয়েকশত নির্যাতন ক্যাম্প ও বধ্যভূমিতে অসংখ্য মানুষকে হত্যা করে। সাধারণ বাঙালিকে বিভিন্ন প্ররোচনা দেখিয়ে ধরে নিয়ে হত্যা করে। রেশনদানের ছলে চুয়াডাঙ্গায় রেশনের দোকানে ডেকে মেশিনগান চালিয়ে অনেক মানুষকে হত্যা করে।

জীবন রক্ষার জন্য শেষ চেষ্টাও ব্যর্থ

দিনাজপুরের কাহারোল উপজেলার রসুলপুর ইউনিয়নের গোপালপুর গ্রামের লোকজন মুক্তিযুদ্ধ শুরু হওয়ার পর পর পাকিস্তানি সেনাদের ও স্থানীয় রাজাকারদের অত্যাচারের ভয়ে পাড়া শূন্য করে ভারত পালাতে থাকে। ৬ বৈশাখ (২০ এপ্রিল) তারিখের পর স্থানীয় শান্তি কমিটির অত্যাচারে ভারতের উদ্দেশ্যে রওনা হয়। বোচাগঞ্জ থানার চিলাপাড়া রেলক্রসিংয়ের কাছে এরা সকলে রাজাকার ও পাকিস্তানি সেনাদের হাতে ধরা পড়ে। পাকিস্তানিরা তাদের সেতাবগঞ্জ থানায় সকলকে ধরে নিয়ে এসে থানার দক্ষিণ পাশে পাটের গুদামে গুলি করে হত্যা করে। অনেকে নিহত হলেও রসুলপুর ইউনিয়নের মাত্র গোপালপুর গ্রামের ১২ জন শহিদের নাম পাওয়া যায়।[১৮]

দিনাজপুর শহরের পূর্ব-দক্ষিণ প্রান্তে পাকিস্তানিরা অবাঙালি বিহারিদের বসবাসের জন্য নিউটাউন কলোনি গড়ে তোলে। মুক্তিযুদ্ধের সময় এখানে প্রায় দু'হাজার অবাঙালি বিহারিদের আবাস ছিল।

নিউটাউনে প্রায় একটা আতঙ্ক পরিবেশ ছিল সব সময়। ৬ বৈশাখ (২০ এপ্রিল) পাকিস্তানিরা দিনাজপুরের উত্তর ফরিদপুরের বাড়ি-ঘর আগুনে পুড়িয়ে দেয়। লোকজন যে যার মতো পালিয়ে জীবন রক্ষা করতে থাকে। এমন সময় কানু ও ভাকে বাড়ির ভিতর মুরগির ঘুনডিয়ার মধ্যে লুকিয়ে যায়। খানসেনারা দেখতে পেয়ে সেখানেই তাদের নির্মমভাবে গুলি করে হত্যা করে।[১৯]

বেয়নেট দিয়ে চোখ তুলে নেয়

পাকিস্তানি সেনার ১২ জনের একটি দল রামসাগর ক্যাম্প থেকে টহল দিতে এসে দুপুরের দিকে দিনাজপুরের ঘুঘুডাঙ্গা আক্রমণ চালায়। ঘুঘুডাঙ্গা গ্রামটি ৬নং আউলিয়াপুর ইউনিয়নের ৩নং ওয়ার্ডে। রামসাগর থেকে সোজা পশ্চিমে প্রায় ৩ কিলোমিটার এবং খাড়িপাড়া থেকে ২ কিলোমিটার দক্ষিণ-পশ্চিমের

সুন্দরা ক্যাম্পগামী রাস্তার ওপর।

দুপুরে ঘুঘুডাঙ্গার মোল্লাপাড়া, পুরাতনপাড়া, গৌরীপুর ও ভোজনাপাড়া এলাকায় প্রবেশ করে কয়েকজনকে ধরে রামসাগর নিয়ে যায়। সেখানে নির্যাতনের পর গুলি করে হত্যা করা হয়। শুকু মোহম্মদকে পাড়ার রাস্তায় তেড়ে ধরে বেয়নেট দিয়ে তার চোখ তুলে নেয়। তারপর লাঠি দিয়ে প্রহার করে বেয়নেট দিয়ে খুঁচিয়ে খুঁচিয়ে হত্যা করে। পরে গ্রামের কয়েকজন বয়স্কলোক লাশটিকে মাটি চাপা দেয়। আর শামসুদ্দিনকে ধরে পাথরঘাঁটায় নিয়ে গিয়ে গাছের সাথে বেঁধে ঝুলিয়ে নির্মমভাবে মারতে মারতে মেরে ফেলে। পরে এ লাশটিকে খুঁজে পাওয়া যায়নি। আবুল হোসেন ও এসু মোহম্মকে রামসাগর ধরে নিয়ে যায় এবং নির্যাতনের পর গুলি করে হত্যা করে।[২০]

চট্টগ্রামে নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠার জন্য মাসব্যাপী অপারেশন শুরু করে

১৯৭১ সালে দক্ষিণ চট্টগ্রামে প্রথম গণহত্যা হয় বোয়ালখালী উপজেলার শাকপুরায়। পাকিস্তানি বাহিনী ও দেশীয় দোসরদের বর্বর নির্যাতনে নিহত হয় প্রায় দেড় শতাধিক মানুষ। শাকপুরা বধ্যভূমি শহিদ মিনার ও মুক্তিযোদ্ধা স্মৃতিস্তম্ভ নির্মাণ পরিষদের সভাপতি কমরেড সুনীল চক্রবর্তী বলেন, ১৯৭১ সালের ৩০ মার্চ মুক্তিযোদ্ধারা শাকপুরার দক্ষিণ প্রান্তের বোয়ালখালী খালের ওপর মিলিটারী পুলের কাঠের পাটাতন ভেঙ্গে দেয়। এতে দক্ষিণ চট্টগ্রামের সাথে যোগাযোগ বন্ধ হয়ে যায়।

১১ এপ্রিল কালুরঘাট যুদ্ধে মুক্তিযোদ্ধাদের পশ্চাৎপসারণের পর পাকিস্তানি বাহিনী দক্ষিণ চট্টগ্রামে নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠার জন্য মাসব্যাপী অপারেশন শুরু করে। ১৬ এপ্রিল কালুরঘাট সেতু অতিক্রম করে দক্ষিণ দিকে অগ্রসর হতে গিয়ে মিলিটারী পুলে বাধাগ্রস্থ হয়।[২১]

পাকিস্তানি সৈন্য হত্যার প্রতিবাদে চালায় নরকীয় তাণ্ডব

৬ বৈশাখ (২০ এপ্রিল) চট্টগ্রামের মিরসরাইয়ের মায়ানী ইউনিয়নের সৈদালী গ্রামে গণহত্যা, ধর্ষণ, লুটতরাজ আর অগ্নিসংযোগ চালায় পাকিস্তানি বাহিনী।

চট্টগ্রাম থেকে পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর একটি বিশাল গাড়ি বহর ঢাকা-চট্টগ্রাম মহাসড়ক হয়ে (তৎকালীন ট্রাংক রোড) বড়তাকিয়া বাজার অতিক্রম করার খবরে কর্ণেল অলি আহম্মদের নেতৃত্বে মুক্তিযোদ্ধারা স্থানীয় ফেনাফুনি পুলের নীচে প্রতিরোধ দুর্গ গড়ে তোলে।

সকাল ১১টার নাগাদ পাকিস্তানি বাহিনীর গাড়িবহর বড়তাকিয়া বাজার

অতিক্রম করার সময় লুকিয়ে থাকা মুক্তিসেনারা আক্রমণ চালায়। থেমে থেমে বিকাল আড়াইটা পর্যন্ত চলে প্রতিরোধযুদ্ধ। পরে মুক্তিযোদ্ধাদের গোলাবারুদ ফুরিয়ে গেলে তাঁরা পিছু হটতে বাধ্য হন। এ প্রতিরোধ যুদ্ধে শহিদ হন হাবিলদার সিদ্দিক ও ল্যান্স নায়েক আবুল কালাম। ওই যুদ্ধে দুইশ থেকে আড়াইশ পাকিস্তানি আর্মি হতাহত হয়। মারাত্মক ক্ষতিগ্রস্ত হয় তাদের বহনকারী সম্মুখভাগে থাকা ১০-১২টি গাড়ি।

বিকাল ৩টার দিকে ক্ষুব্ধ পাকিস্তানি বাহিনী প্রতিশোধপরায়ন হয়ে বড়তাকিয়া বাজারের পশ্চিম পাশের চারটি সড়ক হয়ে প্রবেশ করে সৈদালী গ্রামে। সেখানে তারা ঘরে ঘরে চালায় নারকীয় তাণ্ডব। লুটতরাজ শেষে জ্বালিয়ে দেয়া হয় গ্রামের শতাধিক ঘরবাড়ি। সেদিনের ঘটনায় নিহতদের মধ্যে ২২ জনের পরিচয় শনাক্ত করা সম্ভব হয়েছে। যার মধ্যে ২১ জনকে গ্রামের ভূঁইয়া পুকুরপাড়, লতু পুকুরপাড় ও বিভিন্ন জমির গণকবরে সমাহিত করা হয়েছে। অন্য একজনের লাশ খুঁজে পায়নি স্বজনেরা।

মাত্র ১২ বছর বয়সে জাহানারা হারিয়েছেন বাবা, চাচা আর ফুফাতো ভাইকে। পঞ্চম শ্রেণির ছাত্র আলাউদ্দিন হারিয়েছেন সংসারের একমাত্র উপার্জনক্ষম ব্যক্তি বাবাকে। রৈয়ছা বেগম হারিয়েছেন স্বামী। শাহজাহান হারিয়েছেন বাবা আর চাচা। অগ্নিসংযোগে পুড়ে মারা যান জোবায়দা খাতুন। সম্মুখযুদ্ধে শহিদ হন গ্রামের টগবগে তরুণ বজলুর রহমান।[২২]

স্কুল হয়ে যায় জল্লাদখানা

মুক্তিযোদ্ধারা পাকিস্তানি সেনাদের গতিরোধ করার জন্য ৬ বৈশাখ (২০ এপ্রিল) কালাপোল সেতুটি ভেঙ্গে দেন। কিন্তু তাতে পাকিস্তানি বাহিনীকে ঠেকানো যায়নি। পরবর্তীতে কালাপোল সেতু এবং চৌমুহনীর চৌরাস্তায় অবস্থিত পলিটেকনিক্যাল হাইস্কুলটি নোয়াখালীর সর্ববৃহৎ জল্লাদখানা পরিণত করে।[২৩]

বিক্ষিপ্তভাবে গোলাগুলিতে প্রাণ ত্যাগ

পাকিস্তানি সেনারা নাটোরের বনপাড়ার আশেপাশে আসে এবং বিক্ষিপ্তভাবে গোলাগুলি চালালে ৪ জন লোক- যতীন্দ্রনাথ পাল, পঞ্চানন দত্ত, রথীকান্ত দাস, দশ-এগারো বছরের বালক হরেন্দ্রনাথ দাস গুলিবিদ্ধ হয়ে ঘটনাস্থলেই মারা যান।[২৪]

বেয়নেট দিয়ে খুঁচিয়ে খুঁচিয়ে নিষ্ঠুরভাবে হত্যা করে

৬ বৈশাখ (২০ এপ্রিল) পাকিস্তানি বাহিনী ব্রাহ্মণবাড়িয়ার সরাইল উপজেলাস্থ নোয়াগাঁও ইউনিয়নের কুচনি গ্রামে হামলা চালায়। তখন গ্রামটি ছিল হিন্দু বসতি এলাকা।

কুচনি গ্রামে প্রবেশ করেই পাকিস্তানি বাহিনী বাড়িঘরে আগুন জ্বালিয়ে দেয়। এতে গ্রামের ৫০টি বাড়িপুড়ে ধ্বংস হয়ে যায়। এসময় গ্রামের নারী-পুরুষ শিশুসহ প্রায় সকলেই প্রাণ নিয়ে অন্য গ্রামে পালিয়ে যায়। যারা পালাতে পারেন নি তাদের মধ্যে ৪ জন মহিলাসহ ৯জনকে আটক করে কুচনি খেলার মাঠে (বর্তমান কুচনি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় প্রাঙ্গণ) নিয়ে গুলি করে হত্যা করা হয়। তাদের কাউকে কাউকে বেয়নেট নিয়ে খুঁচিয়ে খুঁচিয়ে নিষ্ঠুরভাবে হত্যা করা হয়েছে। এরপর তাদেকে একসাথে মাটি চাপা দেওয়া হয়।[২৫]

তিন কন্যাকে গুলি করে

সকাল ১০টার দিকে পাকিস্তানি বাহিনী কতিপয় বিহারিসহ চাঁপাইনবাবগঞ্জ জেলা সদরের ডা. মোমতাজের বাসায় প্রবেশ করেই তাঁকে গুলি করে হত্যা করে। এরপর তাঁর তিন কন্যাকে গুলি করে। বড় মেয়ে মাহমুদা খাতুন গুলিবিদ্ধ হয়ে আহত হন। কিন্তু তার ছোট দুই বোন তৎক্ষণাৎ মৃত্যুবরণ করে। তাদের নাম মাহবুবা খাতুন (১৩) ও মাস্তুরা খাতুন (৫)। সেদিন ঐ বাড়িতে বেড়াতে আসা মো. হাবিব নামক ১৩/১৪ বছরের এক কিশোরও গুলিবিদ্ধ হয়ে মৃত্যুবরণ করে। পারিবারিক গোরস্থানে তাদেরকে দাফন করা হয়।[২৬]

৭

৭ বৈশাখ ১৩৭৮। দিনটি ছিল বুধবার একাত্তরের ২১ এপ্রিল। এই দিনে পাকিস্তানি সেনারা রাজবাড়ীর গোয়ালন্দ ঘটের মুক্তিযোদ্ধাদের প্রতিহত করে রাজবাড়ী ও ফরিদপুর জেলায় প্রবেশ করে। এছাড়া ময়মনসিংহ আক্রমণের তোড়জোড় রুশ ট্যাঙ্কে সজ্জিত পাকিস্তানি বাহিনী ঢাকায় পৌঁছেছে কুষ্ঠিয়া, মেহেরপুর পুনর্দখল করে। তারা কয়েকটি জেলাকে ইতিমধ্যে শ্মাশানে পরিণত করে।

নির্বিচারে গুলি ও বেয়নেট দিয়ে খুঁচিয়ে খুঁচিয়ে হত্যা করে

সকালে পাকিস্তানি সেনারা সাতক্ষীরা টাউন হাইস্কুল (বর্তমান সরকারী উচ্চ বিদ্যালয়) পূর্বাঞ্চল থেকে আগত আশ্রিত শরণার্থীদের পার্শ্ববর্তী দীনেশ

কর্মকার এর বাড়ীতে নিয়ে একের পর এক নির্বিচারে গুলি ও বেয়নেট দিয়ে খুঁচিয়ে খুঁচিয়ে হত্যা করে অসংখ্য নারী ও পুরুষকে। তারপর ট্রাক বন্দী করে বহু কুমারী মেয়েদের নিয়ে সন্ধ্যায় যশোরের দিকে চলে যায়। একই দিনে পাকিস্তানি সেনারা সাতক্ষীরা শহরের রেজিস্ট্রি পাড়ায় এ্যাড: কাজী মসরুর আহমেদ (ক্যাপ্টেন কাজী) এর দ্বিতল বাড়ীর পূর্বাংশ ধ্বংস করে এবং তাঁকে ও তাঁর শ্যালক শেখ মাসুদার রহমানকে গুলি করে হত্যা করে। অতঃপর পাকসেনারা সুলতানপুর কুমারপাড়ায় একই পরিবারের সুরেন্দ্রনাথ পাল, নগেন্দ্রনাথ পাল ও কেষ্টপদ পাল নামে তিনজন হিন্দু সম্প্রদায়ের ব্যক্তিকে হত্যা করে এবং সুলতানপুর শেখ মশির আহমেদ এর তিনতলা বাড়ী ধ্বংস করে দেয়। একই সময় ইছাগাছা এ্যাড: কালীপদ রায়ের দ্বিতল বাড়ীও ধ্বংস করে এবং উক্ত বাড়ীর সম্মুখে সাতক্ষীরা সিলভার জুবিলি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষক আব্দুল কাদের ও কাটিয়া নিবাসী পুন্য সাহকে গুলি করে হত্যা করে। এই নরঘাতকরা সাতক্ষীরা কোর্টের মোহরার চণ্ডীদাস ও গোষ্ট বাবুকেও নির্মমভাবে গুলি করে মারে। তাছাড়া, শিক্ষক হরধন বাবু, দেবেন মুখার্জী ও এ্যাড: কার্ত্তিক চন্দ্রের বাড়ী পুড়িয়ে দেয়।

সাতক্ষীরা সদর উপজেলার বর্তমান সাতক্ষীরা সরকারী উচ্চ বালক বিদ্যালয়ের এই পিছন দিয়ে দীনেশ কর্মকারের বাড়ীতে আশ্রয় নিয়েছিল শরণার্থীরা। বর্তমানে এখানে কোন স্মৃতি ফলক নির্মিত না হওয়ায় গণহত্যার নির্দিষ্ট স্থানটি মানুষ ভুলতে বসেছে।[২৭]

পিতার সামনে মেয়েকে ধর্ষণ করা হয়

দেবীপুর গ্রামটি দিনাজপুর জেলার ফুলবাড়ির শিবনগর ইউনিয়নের ছোট যমুনা নদীর পশ্চিমে অবস্থিত। দুপুরের দিকে ৫০ জন পাকিস্তানি সেনা ও দেড়শত জন স্থানীয় বিহারি রাজাকারের একটি দল পুরো গ্রাম ঘেরাও করে লুটপাট ও অগ্নিসংযোগ করে। এ সময় আবুল কাশেম বানিয়া ও তার কিশোরী মেয়ে রাহেনা খাতুন আছির মাস্টারের বাড়িতে গিয়ে আশ্রয় নেয়। পাকিস্তানিরা তাদের দেখে ফেলে এবং পিতার সামনে মেয়েকে ধর্ষণ করে তার স্তন দুটো কেটে গাছে পেরেক মেরে আটকিয়ে দেয়। আবুল কাশেম (৫০), পিতা: আজিমুদ্দিনসহ একই পাড়ার সাদেকুল ইসলাম (২৫), পিতা: মোসলেম প্রামাণিকসহ ৩ জনকে গুলি মেরে হত্যা করে।[২৮]

মৃত মায়ের পাশে পড়ে ছিল শিশুটি

বিকেল ৩টায় পাকিস্তানি সেনারা রতনপুর গ্রামে গণহত্যা সংঘটিত করেছে।

রতনপুর গ্রামটি খানপুর ইউনিয়নে অবস্থিত। এই গণহত্যার দিন মুক্তিযোদ্ধাদের সন্ধানে প্রায় ৩০ জন পাকিস্তানি সেনা এ গ্রামটি ঘেরাও করে। সমগ্র রতনপুর গ্রামটি পাকিস্তানিরা স্থানীয় রাজাকারদের সহযোগীতায় আগুন দিয়ে পুড়িয়ে দেয়। তার আগে গ্রামটির মূল্যবান জিনিসপত্র লুট করা হয়। সমস্ত মানুষ গ্রাম ছেড়ে পালিয়ে যায় স্থানীয় জঙ্গলের দিকে।

পাকিস্তানিরা গ্রামের সাধারণ মানুষকে ধরে গুলি করে এবং জবাই করে নির্মমভাবে হত্যা করে। নবাবগঞ্জ চেরাগপুরের এক মা তার শিশু বাচ্চাকে কোলে নিয়ে আশ্রয় নিয়েছিল এই রতনপুর গ্রামে। পাকিস্তানিরা মাকে গুলি করে হত্যা করে। তখনও অবুঝ বাচ্চাটি মায়ের বুকের দুধ খাচ্ছিল। সেই বাচ্চা মেয়ে একজনের আশ্রয়ে বড় হয়ে এখনো জীবিত। তার নাম রুফিনা বাসকে। এছাড়াও তেতুলডাঙ্গা, ঘাটাগ্রাম সহ বিভিন্ন গ্রামের ৭ জন লোক এই গ্রামে আশ্রয় নিয়েছিল। পাকিস্তানি সেনারা ও রাজাকারের বাহিনী তাদের ধরে গলা কেটে হত্যা করে। পাকিস্তানি বাহিনী রতনপুর গণহত্যায় ১৫ জনের অধিক মানুষকে হত্যা করে।[২৯]

ক্ষুব্ধ পাকিস্তানি বাহিনী নির্বিচারে গ্রামবাসীকে হত্যা

রাত ১০টার দিকে নাভারনের বেতনা নদী পেরিয়ে পুরান বাজারের পাট গুদামের কাছে ক্যাপ্টেন হাফিজের নেতৃত্বে মুক্তিবাহিনী পাকিস্তানি বাহিনীর ওপর সফল অভিযান পরিচালনা করেন। এতে ১০ জন পাকিস্তানি সেনা নিহত ও ১৫ জন আহত হয় এবং মুক্তিবাহিনীর পক্ষে হাবিলদার মতিন শহিদ হন। এসময় পাকিস্তানি বাহিনী মুক্তি বাহিনীকে ধাওয়া করে যশোরের পোতাপাড়া—লাউতলা এলাকা পর্যন্ত চলে আসে। ক্ষুব্ধ পাকিস্তানি বাহিনী মুক্তিযোদ্ধাদের উপর ক্ষিপ্ত হয়ে বেশ কয়েকজন বাঙালিকে ধরে এনে নির্মমভাবে হত্যা করে। পাকিস্তানি সেনারা এইদিন গ্রামের প্রায় ২০ জন মানুষকে নির্বিচারে হত্যা করেছিল।[৩০]

সাধুরা তখন এক ধ্যানে জয় 'জগদ্বন্ধু' জপছিল

পাকিস্তান সেনারা ৭ বৈশাখ (২১ এপ্রিল) ফরিদপুর শহরে প্রবেশ করে, গোয়ালচামটে শ্রী জগদ্বন্ধু সুন্দরের স্মৃতিবিজড়িত শ্রীঅঙ্গনে কীর্তনরত অবস্থায় ৮ জন সাধুকে নৃশংসভাবে হত্যা করে। পাকিস্তান সেনারা ফরিদপুর প্রবেশের পর বেশির ভাগ সাধু আঙিনা ত্যাগ করলেও ৯ জন সাধু আঙিনা ত্যাগ করেনি। সন্ধ্যার সময় পাকিস্তান সেনারা আঙিনা ঘিরে ফেলে। সাধুরা তখন এক ধ্যানে জয় 'জগদ্বন্ধু' জপছিল। কথিত আছে, পাকিস্তান সেনারা মনে

করে, তারা ‘জয় বাংলা’ বলছে। পাকিস্তান সেনারা কীর্তন ঘরে প্রবেশ করে সাধুদের জোরপূর্বক টেনে হিঁচড়ে কীর্তন ঘরের সামনে জড়ো করে। তারপর ব্রাশফায়ার করে তাদের হত্যা করা হয়।

শ্রীঅঙ্গনের নিহত আট সাধু হলেন কীর্তনরত ব্রহ্মচারী, নিদানবন্ধু ব্রহ্মচারী, অন্ধকানাই ব্রহ্মচারী, বন্ধুদাস ব্রহ্মচারী, ক্ষিতিবন্ধু ব্রহ্মচারী, গৌরবন্ধু ব্রহ্মচারী, চিরবন্ধু ব্রহ্মচারী ও রবিদাস ব্রহ্মচারী। পরদিন ২২ এপ্রিল ভোরে ফরিদপুর মিউনিসিপ্যালটির ট্রাক এসে শহিদদের মরদেগুলো নিয়ে যায়। এ দিন পাকিস্তানি সেনারা দাঁড়িয়ে থেকে শ্রীঅঙ্গনে বিহারি ও রাজাকারদের দিয়ে লুটপাট চালায়।

২৬ এপ্রিল ডিনামাইট দিয়ে শ্রীঅঙ্গনের মূল ভবনের একাংশ ও মন্দিরের চূড়া ধ্বংস করে দেয় তারা। গবেষক রবীন্দ্রনাথ ত্রিবেদী জানান, ক্যাপ্টেন জামশেদ যিনি এই হত্যাকাণ্ডের আদেশ দেন, তিনি ১৬ই ডিসেম্বর আত্মসমর্পণের কয়েকদিন আগেই জগৎবন্ধু সুন্দরয়ের বেদীর সামনে আত্মহত্যা করেছিলেন। মৃত্যুর কয়েকদিন আগে তিনি নাকি উন্মাদ হয়ে গিয়েছিলেন। তাকে শ্রীঅঙ্গনের শিব মন্দিদের পুকুরের নিকটবর্তী স্থানে রাজাকার ও বিহারিরা দাফন করে।[৩১]

কোলের শিশু মুজিবর পড়েছিল মায়ের পাশে

৭ বৈশাখ (২১ এপ্রিল) পাকিস্তানি সেনারা গোয়ালন্দ ঘাট হয়ে ফরিদপুর ও রাজবাড়ী জেলায় প্রবেশ করে। পাকিস্তানি সেনারা প্রবেশের সময় স্থানীয় আওয়ামী লীগের সদস্য এবং মুক্তিযোদ্ধারা পাকিস্তানি সেনাদের বাঁধা দেন। সেই সময় পাকিস্তানি সেনারা ক্ষিপ্ত হয়ে রাজবাড়ী জেলার বালিয়াডাঙ্গা গ্রামে আক্রমণ করে। মুক্তিযোদ্ধারা পাকিস্তানি সেনাদের প্রতিরোধ করার চেষ্টা করেন। কিন্তু পাকিস্তানি সেনাদের ভারি অস্ত্রের কাছে মুক্তিযোদ্ধারা ব্যর্থ হয়। পাকিস্তানি বাহিনীর গুলিতে বালিয়াডাঙ্গা গ্রামের ২০ জনের বেশি মানুষ শহিদ হন।

বালিয়াডাঙ্গা গ্রামের আহম্মদ আলীর বাড়িতে বেঁচে থাকার জন্য বাংকার করে ৯ জন আশ্রয় নেয়। পাকিস্তানি সেনারা তাদের সেখানে গুলি করে। পাকিস্তানি সেনাদের গুলিতে ৭জন শহিদ হয়। কোলের শিশু মুজিবর ও ৫ বছরের শহিতন ভাগ্যক্রমে বেঁচে যায়। তারা এই ছয় দিন মায়ের পাশে পড়েছিল। ৬ দিন পরে স্থানীয় গ্রামবাসী শহিদদের বাংকারের মধ্যে দাফন করেন।[৩২]

এলোপাথাড়ি গুলি চালায়

২১ এপ্রিল পাকিস্তান বাহিনী প্রথম পরিকল্পিত গণহত্যা শুরু করে চট্টগ্রামের আনোয়ারায়। খিলপাড়া গ্রামে এলোপাথাড়ি গুলি চালালে স্থানীয় গ্রামের শশাঙ্ক বিমল আইচ, বীরেন্দ্র কুমার আইচ, নিকুঞ্জ নাথ, নরেন্দ্র লাল নাথ, প্যারি মোহন শীল, নতুন চন্দ্র শীল ও মনি নাথ শহিদ হন।[৩৩]

হত্যা করে মহানন্দার পানিতে ভাসিয়ে দেয়

৩০/৪০ জনের একটি পাকিস্তানি সৈন্যদের দল স্থানীয় দালালদের সহযোগীতায় নওগাঁ শহরের রেহাইচর, টিকরামপুর, শিবতলা, হাসপাতাল মোড়, মহানন্দার চরে ক্ষেতে কর্মরত কৃষক, সড়ক পথের যাত্রী, গরুর গাড়ীর গাড়োয়ান এভাবে প্রায় পাঁচশ নিরীহ মানুষকে ধরে নিয়ে মহানন্দার তীরে শ্মশানঘাটে সমবেত করে।

সকাল ৬টা থেকে বিকেল পর্যন্ত এভাবে লোক সমাগম করতে থাকে। এদের কাউকে সভার কথা বলে নিয়ে আসে। দুপুর থেকেই আটককৃত লোকদের মধ্য থেকে একজন/দুজন করে হতভাগা মানুষদেরকে গুলি করে হত্যা করে মহানন্দার পানিতে ভাসিয়ে দিতে থাকে। আটককৃতদের মধ্যে যারা বৃদ্ধ তাদেরকে জ্যান্ত নদীতে ফেলে দেয়। তাদের মধ্যে যারা সাঁতার জানে তারা নদীর ওপারে চলে যায়। অনেকের সলিল সমাধি হয়। এরপর দফায় দফায় তারা একেক গ্রুপে ৫-৭ জনকে গুলি করে হত্যা করে মহানন্দাতে ফেলে দেয়। সন্ধ্যে নাগাদ তারা প্রায় পাঁচশ নিরীহ নিরস্ত্র মানুষকে হত্যা করে মহানন্দায় ফেলে দেয়। ডিসেম্বর মাসের প্রথম সপ্তাহ পর্যন্ত শ্মশানঘাটে পাকিস্তানি বাহিনীর গণহত্যা অব্যাহত থাকে।

২৫ পাঞ্জাব রেজিমেন্টের সৈনিকরা ৭ বৈশাখ (২১ এপ্রিল) আত্রাই হয়ে রানীনগরের দিকে অগ্রসর হয় এবং চকের ব্রিজে এসে থেমে যায়। কারণ আগের দিন আনসার, মুজাহিদসহ বাঙালিরা ব্রিজটি ভেঙ্গে দিয়েছিল। ভাঙ্গা ব্রিজ দেখে পাকিস্তানি সেনারা সেখানে থেমে গিয়ে রানীগঞ্জ রেল স্টেশনের দিকে শেল নিক্ষেপ করতে থাকে। পাকিস্তানিদের একটি অংশ ট্রেন থেকে নেমে নিকটবর্তী চকবলরাম, বেলবাড়ি ও দাউদপুর গ্রামে গণহত্যা চালায় এবং এইসব গ্রামের কয়েক শত ঘর-বাড়িতে আগুন ধরিয়ে দেয়। তারা চকের ব্রিজ ঠিক করে নিয়ে ২২ এপ্রিল সকাল ৯টার দিকে রানীনগরে যায় এবং সেখানকার বেশ কিছু দোকানপাট পুড়িয়ে দেয়।

রানীগঞ্জ রেল স্টেশনের পূর্বদিকে অবস্থিত পুকুর পাড়ে রাজাপুর গ্রামের সফিউদ্দিন খলিফাকে (৪০) হত্যা করে। এছাড়া একই গ্রামের

কায়েমউদ্দিনকে (৪২) হত্যা করে রানীগঞ্জ মসজিদের ধারে। এভাবে তারা রাজাপাড়াসহ আশে-পাশে ব্যাপক গণহত্যা চালায়। অগ্নিসংযোগ ও গণহত্যার ঘটনা ঘটাতে ঘটাতে পাকিস্তানি সেনারা ট্রেনে করে রানীনগর হতে সান্তহারের দিকে এগিয়ে যায়। যাওয়ার পথে রানীনগর-সান্তাহার রেল পথের পূর্বধারে কেল্লাপাড়ায় এক বৃদ্ধা দম্পতিকে হত্যা করে। এভাবে মুক্তিযুদ্ধের শুরুতে রানীনগর রেল স্টেশন সংলগ্ন ৬-৭টি গ্রামে বিক্ষিপ্ত গণহত্যার ঘটনায় ৫০ জনের বেশি মানুষকে হত্যা করে।[৩৪]

ঝোপঝাড়ে ঝুঁপড়ি বেঁধে আশ্রয় নেওয়া বাঙালিকে হত্যা করে

পাকিস্তানের ২৫ পাঞ্জাব রেজিমেন্টের সদস্যরা রাজশাহী হতে নওগাঁর দিকে রেলপথে রওনা দিয়ে ৭ বৈশাখ (২১ এপ্রিল) বিকাল ৩টার দিকে আত্রাই রেল স্টেশন সংলগ্ন আত্রাই নদী তীরবর্তী এলাকায় অবস্থান নেয় এবং নদীতীরে ও স্টেশনের আশে-পাশের ঝোপঝাড়ে ঝুঁপড়ি বেঁধে আশ্রয় নেয়া বেশ কিছু লোককে ৪-৫ দফায় গুলি চালিয়ে হত্যা করে। আত্রাই রেল স্টেশনের কাছে ঝুঁপড়ি বাঁধা গরীব মানুষেরাই নওগাঁ জেলায় প্রথম গণহত্যার শিকার হয় পাকিস্তানি বাহিনীর হাতে। এখানে প্রায় ২৫ জনের অধিক লোককে হত্যা করা হয় যাদের সবাই ছিলেন দরিদ্র।[৩৫]

৮

বৈশাখ মাসের ৮ তারিখ বৃহস্পতিবার ২২ এপ্রিল ১৯৭১। অন্যন্য দিনের মত এই দিনেও সেনাবাহিনীর নির্যাতন ও নিপীড়ন অব্যাহত থাকে।

সকলের হাতেই বিভিন্ন ধরনের দেশি বিদেশি অস্ত্র ছিলো

ভোর বেলা পাকিস্তানি বাহিনী পাবনা জেলার আটঘরিয়া উপজেলার মাছদিয়া-মাজপাড়া গ্রামে আক্রমণ করে। এসময় তারা এ গ্রামে অগ্নিসংযোগ করতে থাকে। গ্রামবাসী পাকিস্তানি সেনাদের দেখে পালাতে থাকে। কিন্তু পালানোর কোন সুযোগ সে সময় ছিল না। এই গ্রামের পশ্চিমে নদী এবং অন্য তিন দিকে ছিলো হাজার হাজার অবাঙালিদের অবস্থান। সকলের হাতেই বিভিন্ন ধরনের দেশি বিদেশি অস্ত্র ছিলো। এদিন মাছদিয়া-মাজপাড়া গ্রামে প্রচণ্ড গুলাগুলি হয়। এতে শত শত মানুষ মারা যায় এবং বহু মানুষ আহত হয়। মানুষ মারার পাশাপাশি চলে তাদের পাশবিক নির্যাতন ও নারী ধর্ষণ। এ দিন বিহারিরা পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর সহযোগিতায় মাছদিয়া-মাছপাড়া গ্রামে প্রায় পাঁচশত জনকে হত্যা করে।[৩৬]

পাকিস্তানি সেনা, বিহারি ও রাজাকারদের গণহত্যা

খোলাহাটি দিনাজপুরের পার্বতীপুরের একটি রেলস্টেশনের নাম। খোলাহাটির নিকটবর্তী বদরগঞ্জ পাকিস্তানি সেনাদের ক্যাম্প ছিল। সেখান থেকে তারা বিভিন্ন সময়ে বাঙালি নিধনের অপারেশন পরিচালনা করেছে। তাদের অপারেশনের সময় স্থানীয় বিহারি ও রাজাকাররা সহযোগিতা করেছে। অপারেশনের সময় খোলাহাটি ও আশ-পাশে পাকিস্তানি সেনা ও রাজাকাররা অনেক লোককে গণহত্যা করেছে। ৮ বৈশাখ (২২ এপ্রিল) তারা অপারেশন চালিয়ে অনেক মানুষকে হত্যা করে। খোলাহাটি এলাকায় বিভিন্ন সময়ে পাকিস্তানি সেনা, বিহারি ও রাজাকারদের হাতে যে সকল সাধারণ মানুষ শহিদ হয়েছেন তাদের ৯ জনের নাম পাওয়া যায়।[৩৭]

পালিয়ে যাওয়ার সময় পিছন থেকে গুলি করে হত্যা করে

দিনাজপুর জেলার বোয়ালদার ইউনিয়নের ৫নং ওয়ার্ডের একটি বড় এলাকা বৈগ্রাম। ৮ বৈশাখ (২২ এপ্রিল) বিকেলে গ্রামটি ঘেরাও করে। ঘেরাও করেই যেখানে-সেখানে গুলি করে আতঙ্ক সৃষ্টি করে এবং গ্রামের সকল বাড়িতে অগ্নিসংযোগ করতে থাকে। ভয়ে মানুষ গ্রাম ছেড়ে পালিয়ে যায়। প্রতিরোধ যোদ্ধাদের ধরার জন্য গ্রামটি ঘেরাও করে। তাদের না পেয়ে সাধারণ ব্যক্তিদের ধরে গুলি করে হত্যা করে। আবার কেউ কেউ পাকিস্তানি সেনাদের দেখে পালিয়ে যাওয়ার সময় পিছন থেকে গুলি করে হত্যা করে। পাকিস্তানি সেনাদের দ্বারা এই গ্রামের কয়েকজন নারীকে ধর্ষণ ও নির্যাতনের কথা জানা যায়। এই দিন পাকিস্তানি সেনারা বৈগ্রামে ১৪ জন সাধারণ মানুষকে গুলি করে হত্যা করে।[৩৮]

ধরে বিভিন্ন ভাবে শারীরিক নির্যাতন করে

দিনাজপুর জেলার হাকিমপুর উপজেলার বোয়ালদার গ্রামে পাকিস্তানি সেনারা প্রবেশ করে গ্রামের প্রায় ৩০০ বাড়ি-ঘরের মালামাল লুট করে আগুনে জ্বালিয়ে দেয়। এ কাজে পাকিস্তানিদের সাঙ্গে সহযোগিতা করেছে এলাকার বিহারি জোলারা। গ্রামের মানুষ অনেক আগেই পালিয়ে গিয়েছিল। যারা ছিল তাদের অনেকে পালিয়ে বাঁচে। আবার অনেককে ধরে বিভিন্ন ভাবে শারীরিক নির্যাতন করে। পাকিস্তানিদের গুলিতে এ বোয়ালদার গ্রামের ৪ জন শহিদের নাম পাওয়া যায়।[৩৯]

পাথালিয়া এগারশত বাহাত্তরটি বাড়ি পুড়িয়ে দেয়

১৯৭১ সালের ৮ বৈশাখ (২২ এপ্রিল) পাকিস্তানি বাহিনি মুক্ত জামালপুর দখল করে নিয়ে গণহত্যা, লুটতরাজ ও অগ্নিসংযোগ চালায়। এদিন সন্ধ্যায় শহরের মেডিকেল রোড, ঢাকাই পট্টি, পাথালিয়া, বকুল তলাসহ অনেক এলাকায় তারা আগুন দেয়। এদিন চলে পাকিস্তানি বাহিনি ও তাদের দোসরদের ব্যাপক লুটতরাজ। বেলটিয়া ও পাথালিয়া অসংখ্য বাড়ি আগুন লাগিয়ে পুড়িয়ে দেয়। পাকিস্তানি বাহিনি পাথালিয়া এগারশত বাহাত্তরটি বাড়ি পুড়িয়ে দেয়। পাকিস্তানিরা তৎকালিন মহকুমার আনসার এ্যাডজুটেন্ট ফজলুল হককে নৃশংশ ভাবে হত্যা করে। পাকিস্তানি সেনারা পাথালিয়ার ছাত্রলীগ নেতা আবদুল হালিম ও বেবি চালক সোলেমানকে ধরে নৃশংস ভাবে হত্যা করে। পাকিস্তানিরা যুদ্ধকালীন হত্যা করে প্রাক্তন প্রাদেশিক পরিষদ সদস্য আবদুল হামিদ মোখতার, কেন্দুয়া কালিবাড়ির মজনু, সংগ্রাম পরিষদ সদস্য কামরুদ্দিন খোকা, লাহিড়ীকান্দার আওয়ামী লীগ নেতা ময়নাল হকসহ নাম না জানা অসংখ্য স্বাধীনতাকামী বাঙালিকে হত্যা করে।[৪০]

ছিন্নভিন্ন লাশ ওয়াপদা ভবনের মধ্যে পড়ে থাকে

একাত্তরের ৮ বৈশাখ (২২ এপ্রিল) পাকিস্তানি সেনারা মেহেরপুরের ওয়াপদা মোড়ে সংঘটিত হয়ে গণহত্যা চালায়। শহরে পাকিস্তানি সেনাদের আগমনের সংবাদে ভীত হয়ে সাধারণ মানুষ ওয়াপদা মোড় হয়ে গ্রামের দিকে পালাতে থাকেন। এই সংবাদ পাকিস্তানি সেনারা পেলে ঐখানে এসে বেপোরোয়া ভাবে গুলি চালিয়ে **১৬-১৭** জনকে হত্যা করে। গুলিবিদ্ধ ছিন্নভিন্ন লাশ ওয়াপদা ভবনের মধ্যে, রাস্তার পাশে কমপক্ষে ২-৩ দিন ছড়িয়ে-ছিটিয়ে পড়ে থাকে।[৪১]

কারো মুখে শব্দ ছিল না

৮ বৈশাখ (২২ এপ্রিল)। পাকিস্তানি বাহিনী রংপুর জেলার পায়রাবন্দ ইউনিয়নে ২৬ জনকে গুলি হত্যা করে। মধ্যরাতে পাকিস্তানি বাহিনীর ৫টি ট্রাক পায়রাবন্দ ইউনিয়নে জয়রাম আনোয়ার মৌজা এসে বড় রাস্তার কাছে দাঁড়ায়। আশপাশে তেমন বসতি ছিল না। বড় রাস্তার পূর্ব দিকে দূরে ৩-৪টি ছোট ছোট কুঁড়েঘর ছিল। গাড়ির শব্দে বাড়ির লোকজন জেগে উঠলিও কারো মুখে শব্দ ছিল না।

বেড়ার ফাক দিয়ে মফিজ উদ্দিন উঁকি-ঝুঁকি মারে যদি কিছু দেখা যায়। রাতের আঁধারে কিছুই বোঝা যাই নি। হটাৎ একটানা গুলির শব্দ। গুলি

আধাঘন্টা ধরে চলে। তার পরে আর কোনো শব্দ নেই। মিনিট পনরো পরে ট্রাকগুলো চলে যায়।

পরের দিন ভোরে আশপাশের গ্রামের লোকজন এসে রাস্তার পূর্ব দিকে লাশের গদি দেখতে পান। লোকজন ভয়ে **১১**টি লাশ একখানেই কবর দেয়। রাস্তার পশ্চিম দিকে আরো লাশ পরে ছিল। সেখানে গ্রামবাসী **১৫**টি লাশ পান। সবগুলো লাসের অবস্থা অনেক খারাপ ছিল। গ্রামবাসী তাদের পরিচয় জানেন না। সেদিন যারা শহিদ হয়েছিল তাদের একমাত্র পরিচয় ছিল তারা বাঙ্গালি।[৪২]

পাকিস্তান জিন্দাবাদের পরিবর্তে বার বার *'জয় বাংলা'* শ্লোগান

পাকিস্তানি বাহিনী ৮ বৈশাখ (২২ এপ্রিল) তারিখে নওগাঁ জেলায় প্রবেশ করে। নওগাঁয় প্রবেশ করেই তারা বাঙালি হত্যা ও নির্যাতনে মেতে উঠে। নওগাঁর একটি পরিচিত সেতু লর্ড লিটন সেতু যা সাধারণভাবে বড় ব্রিজ নামে পরিচিত। সেতুটি ছোট যমুনা নদীর ওপর স্থাপিত এবং যমুনা নদী দ্বারা বিভক্ত নওগাঁ শহর সংযুক্ত হয়েছে এই সেতুর মাধ্যমে। শহর গড়ে উঠেছে এই সেতুর দুই পাশ জুড়ে। আকালু পাগলা নামের মানসিক ভারসাম্যহীন এক কিশোরকে এই সেতুতে হত্যার মধ্য দিয়ে নওগাঁ শহর এলাকায় গণহত্যার সূচনা করেছিল। ব্রিজের পূর্ব পাশে পাকিস্তানি সেনারা তাকে পাকিস্তান জিন্দাবাদ বলার নির্দেশ দিয়েছিল। কিন্তু এই কিশোর পাকিস্তান জিন্দাবাদের পরিবর্তে বার বার ***'জয় বাংলা'*** শ্লোগান দিচ্ছিল। এতে পাকিস্তানি সেনারা ক্ষিপ্ত হয়ে তাকে গুলি করে এবং তাৎক্ষণিকভাবে তার মৃত্যু হয়। তার লাশ ফেলে দেয়া হয় ছোট যমুনা নদীতে। তাকে হত্যার পর পাকিস্তানি সেনারা একটি বাড়ির ভিতরে ঢুকে গণহত্যা করে নাট্যাঙ্গণের সক্রিয় কর্মী ক্ষেত্রলাল সাহার স্ত্রী শ্রীমতি বালা সাহা সহ বহু নারীকে। এই বাড়ির ভিতরে বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন স্থান হতে আরো বহু লোককে ধরে এনে গণহত্যা করা হয়েছে যাদের নাম পরিচয় পাওয়া যায় নাই। নারীদের হত্যার আগে তাদের উপর পাশবিক নির্যাতন চালানো হয়েছিল তা নিশ্চিতভাবে জানা যায়।[৪৩]

শহরে ঢুকেই হাট-নওগাঁয় গণহত্যা চালায় পাকিস্তানি বাহিনী। দিনভর ৬০ হতে ৭০ জন লোককে হত্যা করে। শহিদরা দূর-দূরান্তের হওয়ায় তাদের নাম জানা যায়নি। হাট-নওগাঁয় গণহত্যার পাশাপাশি ছিল নির্যাতন, নারী নির্যাতন, লুন্ঠন। অগ্নি সংযোগ করা হয়েছিল হাট-নওগাঁর বহু সংখ্যক ঘর-বাড়ি ও দোকান পাটে।[৪৪]

সকল লাশ যমুনা নদীর পানিতে ভাসিয়ে দিয়েছিল

৮ বৈশাখ (২২ এপ্রিল) হতে তিন-চার দিনের ভেতর পাকিস্তানি বাহিনী ১২৫ জন যুবককে ধরে এনে ছোট যমুনা নদীর লিটন ব্রিজে গণহত্যা করার পর সমস্ত লাশ যমুনা নদীর পানিতে ভাসিয়ে দিয়েছিল। হতভাগা এই যুবকদের সুলতানপুর, পার-নওগাঁ, ধোপাপাড়া, উকিলপাড়া, হাট-নওগাঁসহ বিভিন্ন গ্রাম হতে ধরে আনা হয়েছিল। দফায় দফায় ২০-২৫ জন করে ধরে এনে ব্রাশ ফায়ার চালিয়ে গণহত্যা করা হয়েছিল লিটন ব্রিজের উপর। শুধু তাই নয়, লিটন ব্রিজ যেন মুক্তি বাহিনী ধ্বংস করতে না পারে সেজন্য পাকিস্তানি বাহিনী ও রাজাকার দ্বারা সেখানে নিয়মিত পাহাড়ার ব্যবস্থা করা হয়েছিল। তারা প্রতিনিয়তই কাউকে না কাউকে ধরে নিয়ে এসে গুলি করে দিত।[৪৫]

সাদা পতাকা হাতে নিয়ে বাড়ির ভিতর থেকে বের হয়ে আসেন

পাকিস্তানি বাহিনীর একটি দল বগুড়ার সান্তাহার সীমান্ত সংলগ্ন নওগাঁ সদরের ধামকুড়ি গ্রামে দুপুর ১টার দিকে আক্রমণ করে। তারা চতুর্দিক থেকে গ্রামটি ঘিরে ফেলে এবং বিভিন্ন বাড়িতে অগ্নিসংযোগ ও লুটপাট চালায়। গ্রামের বহু লোককে গুলি চালিয়ে হত্যা করে। সান্তাহার রেলওয়ে থানার কর্মকর্তা শামসুদ্দিন সরদার ছিলেন পুলিশ ইন্সপেক্টর। এখানেই তার গ্রামের বাড়ি। পাকিস্তানি সেনারা প্রধানত তাকে টার্গেট করেই গ্রামটিতে হামলা চালায় ও তার বাড়ি ঘেরাও করে। তিনি পালিয়ে যাওয়ার লোক ছিলেন না। তাই ঘেরাও হওয়ার পর সাদা পতাকা হাতে নিয়ে বাড়ির ভিতর থেকে বের হয়ে আসেন। তার বিরুদ্ধে বাঙালি-বিহারি দাঙ্গার সময় রেলওয়ে থানা (সান্তাহার রেল স্টেশন) কর্মকর্তা হিসেবে বিহারিদের রক্ষায় প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহন না করার অভিযোগ আনা হয়। বিহারিরাই তার বিরুদ্ধে এমন অভিযোগ উত্থাপন করে।

বিহারিদের অভিযোগকে আমলে নিয়ে পাকিস্তানি সেনারা তাকে, তার মেজো ভাই সান্তাহার মালা সিনেমা হলের ম্যানেজার নুরুল ইসলাম সরদার, আরেক ভাই নওগাঁ মুকুল প্রেসের সত্বাধিকারি আব্দুস সামাদ, ভাতিজা বুয়েটের শেষ বর্ষের ছাত্র আমিনুল ইসলাম দুলাল, তৎকালীন সময়ের এসএসসি পরীক্ষায় স্টার মার্ক পাওয়া দিনাজপুরের বিরামপুর কলেজে এইচএসসি অধ্যায়নরত এনামুল ইসলাম মান্না, স্বাস্থ্য পরিদর্শক সালাউদ্দিন মিন্টুসহ একই পরিবারের ১০-১২ জনকে তিন দফায় নির্মমভাবে গণহত্যা করে। শহিদদের লাশ দীর্ঘদিন সেখানে পড়ে থাকে।

পরবর্তী সময়ে এলাকাবাসী লাশের কংকালগুলো একত্রিত করে একটি

গর্তের মধ্যে সমাহিত করেন। একই ঘটনায় শহিদ শামসুদ্দিন সরদারের ১০ বছরের পুত্র (তার নামও সালাউদ্দিন মিন্টু) ডানহাটে গুলিবিদ্ধ হয়ে আহত হয়েছিলেন। চিকিৎসা নিয়ে পরে তিনি সুস্থ হয়ে উঠেন। এই গণহত্যার সময় ঐ বাড়িতে বেড়াতে আসা আরো একজন শহিদ হয়েছিলেন।[৪৬]

পরিবারের লোকেরা পুকুর থেকে লাশ তুলে নিয়ে পারিবারিক কবরস্থানে দাফন করেন

ম্যালেরিয়া রোগের চিকিৎসার জন্য নওগাঁ স্টেডিয়াম সংলগ্ন তথা স্টেডিয়ামের উত্তর দিকে একটি অফিস ছিল যা ম্যালেরিয়া অফিস নামে পরিচিত ছিল। এই অফিসের পাশে একটি কদম গাছ ছিল যেখানে পাকিস্তানি বাহিনী ৮ বৈশাখ (২২ এপ্রিল) লোককে ধরে এনে গণহত্যা করেছে।

শহিদদের অধিকাংশই বাইরের লোক হওয়ায় তাদের নাম পরিচয় জানা যায় নাই। পরদিন নিহতের পরিবারের লোকেরা পুকুর থেকে লাশ তুলে নিয়ে পারিবারিক কবরস্থানে দাফন করেন। এখানে ৮ বৈশাখ (২২ এপ্রিল) গণহত্যার শিকার কয়েকজন হলেন মন্টু, বারী, মজিবর। বিহারিরা এই শহিদদের লাশ একটি পুকুরে ফেলে দেয়।[৪৭]

প্রাণ বাঁচাতে ভারতে আর যাওয়া হলো না

পাকিস্তানি বাহিনী নওগাঁ জেলায় অনুপ্রবেশ করে এবং মুক্তিযোদ্ধাদের সকল প্রতিরোধ ভঙ্গ করে প্রত্যন্ত অঞ্চলে ছড়িয়ে পরে। পাকিস্তানি সেনাদের প্রতিনিয়ত অভিযানের মুখে বাঙালিরা তাদের ঘর-বাড়ি ছেড়ে পালিয়ে যেতে থাকে। শিবগঞ্জ এলাকার কয়েকটি পরিবার মহাদেবপুর- পোরশা সড়ক ধরে গরুরগাড়ি যোগে ভারতের দিকে যাচ্ছিল।

কিন্তু পথে পাকিস্তানি সেনা ও রাজাকাররা তাদেরকে দেখতে পেয়ে আক্রমণ করে এবং ১৫-২০জনকে ধরে ফেলে। তারা বাঙালিদের মালামাল লুট করে এবং নারীদের নির্যাতন করে। যারা তাদের হাতে ধরা পড়ে তাদেরকে খাজুর ইউনিয়নের দেবীপুর মোড় নামক স্থানে গণহত্যা করে। এখানে অন্তত ৫ দফায় ২০ জনকে বিভিন্ন সময়ে গণহত্যা করা হয়েছে বলে জানা যায়। এখানকার গণহত্যার শিকার ব্যক্তিদের দুইজন ছাতরা হাটে গরু কিনতে যাওয়ার পথে ধরা পড়েন এবং গণহত্যার শিকার হন।[৪৮]

[চলবে]

তথ্যসূত্র

১. *যুগান্তর*, ৬ বৈশাখ ১৩৭৮ (২০ এপ্রিল ১৯৭১), পৃ.-১
২. মোজাম্মেল বিশ্বাস, *গণহত্যা-বধ্যভূমি ও গণকবর জরিপ: দিনাজপুর জেলা*, ১৯৭১: গণহত্যা-নির্যাতন আর্কাইভ ও জাদুঘর ট্রাস্ট, খুলনা, ২০১৯, পৃ.১২৭-১২৮
৩. *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১২৫-১২৬
৪. *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১২৮
৫. মো. মাহবুবর রহমান ও তাহসিনা শারমিন, *গণহত্যা-বধ্যভূমি ও গণকবর জরিপ: রাজশাহী জেলা*, ১৯৭১: গণহত্যা-নির্যাতন আর্কাইভ ও জাদুঘর ট্রাস্ট, খুলনা, ২০১৮, পৃ. ৪৩
৬. আজহারুল আজাদ জুয়েল, *গণহত্যা-বধ্যভূমি ও গণকবর জরিপ: লালমনিরহাট জেলা*, ১৯৭১: গণহত্যা-নির্যাতন আর্কাইভ ও জাদুঘর ট্রাস্ট, খুলনা, ২০১৯, পৃ. ৩০
৭. *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৩২-৩৩
৮. আলী ছায়েদ, *গণহত্যা-বধ্যভূমি ও গণকবর জরিপ: পঞ্চগড় জেলা*, ১৯৭১: গণহত্যা-নির্যাতন আর্কাইভ ও জাদুঘর ট্রাস্ট, খুলনা, ২০১৯, পৃ. ৪৪
৯. রোকনুজ্জামান বাবুল ও শিউলী খাতুন, *গণহত্যা-বধ্যভূমি ও গণকবর জরিপ: পাবনা জেলা*, ১৯৭১: গণহত্যা-নির্যাতন আর্কাইভ ও জাদুঘর ট্রাস্ট, খুলনা, ২০১৮, পৃ. ৫১-৫২
১০. আহম্মেদ শরীফ, *গণহত্যা-বধ্যভূমি ও গণকবর জরিপ: বগুড়া জেলা*, ১৯৭১: গণহত্যা-নির্যাতন আর্কাইভ ও জাদুঘর ট্রাস্ট, খুলনা, ২০১৮, পৃ. ৫১
১১. মুনতাসীর মামুন (সম্পা.), *মুক্তিযুদ্ধ কোষ : ২য় খণ্ড*, সময়, ঢাকা, ২০১৩
১২. অমল কুমার গাইন, *প্রাগুক্ত*, ২০১৮, পৃ. ৫৭
১৩. চৌধুরী শহীদ কাদের, *গণহত্যা-বধ্যভূমি ও গণকবর জরিপ: চট্টগ্রাম জেলা*, ১৯৭১: গণহত্যা-নির্যাতন আর্কাইভ ও জাদুঘর ট্রাস্ট, খুলনা, ২০১৯, পৃ. ৪৩
১৪. মো. মাহবুবর রহমান, *গণহত্যা-বধ্যভূমি ও গণকবর জরিপ: চাপাইনবাবগঞ্জ জেলা*, ১৯৭১: গণহত্যা-নির্যাতন আর্কাইভ ও জাদুঘর ট্রাস্ট, খুলনা, ২০২০, পৃ. ২৫-২৬
১৫. আলী ছায়েদ, *প্রাগুক্ত*, ২০২০, পৃ. ৬১
১৬. কাজী সাজ্জাদ আলী জহির, *মুক্তিযদ্ধের আঞ্চলিক ইতিহাস : সিলেট*, বাংলা একাডেমি, ঢাকা, ২০১৮, পৃ. ১৮৫
১৭. সুমা কর্মকার, *গণহত্যা-বধ্যভূমি ও গণকবর জরিপ: নাটোর জেলা*, ১৯৭১: গণহত্যা-নির্যাতন আর্কাইভ ও জাদুঘর ট্রাস্ট, খুলনা, ২০১৮, পৃ. ২৮-২৯
১৮. মোজাম্মেল বিশ্বাস, *প্রাগুক্ত*, ২০১৯, পৃ. ৯২
১৯. *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৫৩-৫৪
২০. *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৫৪
২১. ড. চৌধুরী শহীদ কাদের, প্রাগুক্ত, ২০১৯, পৃ. ৫৭-৫৮
২২. *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৭৯-৮০

২৩. ড. এম. এ. হাসান, *গণহত্যা যুদ্ধাপরাধ ও বিচারের অন্বেষণ*, ওয়ার ক্রাইমস ফ্যাক্টস্ ফাইন্ডিং কমিটি, ঢাকা, ২০০১, পৃ. ৩৮৮
২৪. সুমা কর্মকার, *প্রাগুক্ত*, ২০১৮, পৃ. ৬০
২৫. জয়দুল হোসেন, *প্রাগুক্ত*, ২০১৯, পৃ. ৪১
২৬. মাহবুবর রহমান, *প্রাগুক্ত*, ২০২০, পৃ. ২৪
২৭. ফাহিমা খাতুন, *গণহত্যা-বধ্যভূমি ও গণকবর জরিপ: সাতক্ষীরা জেলা*, ১৯৭১: গণহত্যা-নির্যাতন আর্কাইভ ও জাদুঘর ট্রাস্ট, খুলনা, ২০১৮, পৃ. ২১-২২
২৮. মোজাম্মেল বিশ্বাস, *প্রাগুক্ত*, ২০১৯, পৃ. ১০২
২৯. *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১১৭-১১৮
৩০. শংকর কুমার মল্লিক, *গণহত্যা-বধ্যভূমি ও গণকবর জরিপ: যশোর জেলা*, ১৯৭১: গণহত্যা-নির্যাতন আর্কাইভ ও জাদুঘর ট্রাস্ট, খুলনা, ২০১৯, পৃ. ৩৮
৩১. প্রকাশিতব্য গ্রন্থ: মাসুদ রানা, সহুল আহমদ, আরিফুল হক ও সাব্বির মাহমুদ রাবাত, *গণহত্যা-বধ্যভূমি ও গণকবর জরিপ: ফরিদপুর জেলা*, ১৯৭১: গণহত্যা-নির্যাতন আর্কাইভ ও জাদুঘর ট্রাস্ট, খুলনা
৩২. প্রকাশিতব্য গ্রন্থ: মাসুদ রানা ও আরিফুল হক, *গণহত্যা-বধ্যভূমি ও গণকবর জরিপ: রাজবাড়ী জেলা*, ১৯৭১: গণহত্যা-নির্যাতন আর্কাইভ ও জাদুঘর ট্রাস্ট, খুলনা
৩৩. চৌধুরী শহীদ কাদের, *প্রাগুক্ত*, ২০১৯, পৃ. ৬২
৩৪. আজহারুল আজাদ জুয়েল, *প্রাগুক্ত*, ২০২০, পৃ. ৮৮-৮৯
৩৫. *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৯৫
৩৬. রোকনুজ্জামান বাবুল ও শিউলী খাতুন, *প্রাগুক্ত*, ২০১৮, পৃ. ২৪-২৫
৩৭. মোজাম্মেল বিশ্বাস, *প্রাগুক্ত*, ২০১৯, পৃ. ১১০-১১১
৩৮. *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১২৬
৩৯. *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২৭
৪০. মামুন তরফদার, *প্রাগুক্ত*, ২০১৯, পৃ. ২৯
৪১. রফিকুর রশীদ, *প্রাগুক্ত*, ২০০৯, পৃ. ১১৭
৪২. মুকুল মোস্তাফিজ, *প্রাগুক্ত*, ২০১১, পৃ. ৫৫-৫৬
৪৩. আজহারুল আজাদ জুয়েল, *প্রাগুক্ত*, ২০২০, পৃ. ৩৬
৪৪. *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৪৯
৪৫. *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৩৭
৪৬. *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৪০-৪১
৪৭. *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৪৩-৪৪
৪৮. *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৬০